প্রথম অধ্যায় ॥

সমালোচক মোহিতলালের ব্যক্তি-স্বরূপ

১- কবি থেকে সমালোচক

কবি হিসেবে শুরু করে সমালোচক হিসেবে সাহিত্য জীবন শেষ করেছিলেন মোহিতলাল। কবিতা লেখা ছেড়ে দিলেন কেন - জিজ্ঞাসা করলেই বলতেন রসের উৎসমুখ শুষ্ক হয়ে গেছে, কবিতা লেখার প্রেরণা পাচ্ছেন না।[১] বহু চিঠিতে লিখেছেন এই কথা, বলেছেন "জীবনে আর কোনও আশা উৎসাহ বা রসপিপাসা নাই।"[২] সাহিত্যচর্চা বিশেষত কাব্যচর্চা যে একরকম ছেড়ে দিয়েছেন সে রকম কথাও বার বার বলেছেন নানা প্রসঙ্গে।[৩] মোহিতলাল নিজের কাব্যচর্চার কথা বলতে গিয়ে একসময় লিখেছিলেন :

> আমি কবিতা লিখিতাম আমার আনন্দে - সেই কবিতাই আমার রতি সম্ভোগ, আমার কাব্যলক্ষ্মীর অধরসুধা - তার চেয়ে বেশী কিছু আমি চাইনি। যদি চেয়ে থাকি তবে আমার সেই প্রিয়তমাকে অপমান করেছি। ... কবিতার আসল definition এই : কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে আত্মার রতিসুখ সম্ভোগকালে রসমূর্ছিত মানবের দিব্যভাব-বিধুর গদগদভাষ।[৪]

কিন্তু নানা কারণে এই জীবনরসপিপাসা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিয়ে কবিতা লেখার চেয়ে সমালোচনা লেখার কাজে মন দিতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে যেন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। তাঁর এই সময়কার চিঠিপত্রে ক্লান্তি বিষণ্নতা আর অবসন্নতার কথা বহু ব্যক্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে। মোহিতলাল ঢাকার চাকরি নিয়েছিলেন উৎকট দারিদ্র্যের হাত থেকে অসহায় স্ত্রীপুত্রকে রক্ষা করতে। তাঁর নিজের স্বাস্থ্যও খুব ভেঙে গিয়েছিল। এসব কথা কালিদাস রায়কে তিনি নিজে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন।[৫] আর এরও বহু বছর পরে ১৯৪৭ এর ৩০শে জুন একটি চিঠিতে পৃথ্বীশ নিয়োগীকে লিখেছেন - গঁপা জ্যানগথকে সে কথা প্রায় একই ভাষায় লিখেছিলেন :

> সাহিত্য সেবার জন্য শুধুই অবসর নয় পারিপার্শ্বিক নির্বিঘ্নতাও চাই, আর চাই সাংসারিক দুশ্চিন্তা হইতে অব্যাহতি।[৬]

কিন্তু ঢাকায় গিয়ে তিনি কাব্যরচনার অনুকূল পরিবেশ পাননি। তিনি নিজেই বলেছেন "বাণীসেবার সমাধি হিসেবেই"[৭] তিনি ঢাকার চাকরি নিয়েছেন। তিনি ঢাকায় গিয়ে বুঝেছেন সেখানকার "মানসিক আবহাওয়া কাব্যচর্চার অনুকূল নয়"।[৮]

যেমন পরিবেশের প্রতিকূলতা, উৎকট দারিদ্র্য, তাঁর রসক্ষীনতার কারণ, তেমনি "পারিপার্শ্বিক নির্বিঘ্নতা"র অভাব। পরিপার্শ্ব তাঁর কাছে বাংলা সাহিত্যের তদানীন্তন পরিবেশ; আর এই পরিবেশও প্রতিকূল। ১৯২৩ সালে প্রবোধ চন্দ্র সেনকে লেখা চিঠিতে সে পরিবেশের পরিচয় দিয়ে লিখেছেন mutual admiration Society-র মেম্বার হইতে না পারিলে আর গত্যন্তর নাই।[৯] আর যেহেতু এই "hypocrisy"[১০] তিনি সহ্য করতে পারেন না তাই তাঁকে অনবরত এইপরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। যুদ্ধ করেছেন বাংলা সাহিত্যে একটু সুদিন আনবার জন্য, সু-পরিবেশ তৈরি করবার জন্য। ঐ একই চিঠিতে বলে দিচ্ছেন তিনি তদানীন্তন সাহিত্য সমাজের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতে পারছেন না বরং সত্য-সুন্দরের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আর এ যুদ্ধ তাঁর কাছে ভগবদকর্ম:

> আমি ভগবদ নির্দিষ্ট কাজ করিতে জন্মিয়া ছিলাম, আমার সুখ দুঃখ জয় পরাজয় আমার নয় তাহার।[১১]

সুতরাং দেখতে পাচ্ছি তাঁর কবিতা লেখা স্তিমিত হয়ে গিয়েছে যে জীবনরস ক্ষীণতার জন্য তার মূলে আছে অধঃপতিত সময়ের দায়িত্ব। তাই তাঁর মনের ভিতরকার কল্পনা কণিকা "দেশকালের প্রভাবে"[১২] কাব্য কুসুম হয়ে ফুটে উঠতে পারেনি। যতই তিনি সচেতন হয়েছেন দেশকালের প্রতি দায়িত্বে, ততই শিল্পের প্রতি প্রখর হয়েছে তাঁর কর্তব্যবোধ আর ভিতরে ভিতরে ক্লান্তির অভিকর্ষে ভেঙে গেছেন তিনি, ভেঙে গেছে তাঁর প্রেমানুরাগ, কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় মিলন। আর তাই সেই ১৯২৮ থেকে তাঁর মনে হচ্ছে সমুদ্র ও আকাশের মোহনায় শীঘ্রই গড়িয়ে পড়বেন তিনি, ভাঁটার টানে অস্তাচলের অন্ধকারে পূর্ণ বিস্মৃতির মধ্যে শান্তিলাভ করতে পারলেই তাঁর শেষ সাধ পূর্ণ হয়।[১৩] নিজের কাব্য পরিচয় দিতে গিয়ে কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে যে নিবিড় প্রেমের কথা বলেছিলেন অথবা বলেছিলেন স্বপ্নরসাবেশে জীবনকে আস্বাদন করবার

কথা,[১৪] সে সুপ্তাবেশ শেষ জীবনে আর ছিল না কেবল জীবন মরুভূমির যৌবন মরূদ্যানের ধ্যানসুপ্তে শেষ জীবন যাপন করে গেছেন।[১৫]

জীবনরস-ক্ষীণতার জন্য শুধু নয় আগেই উল্লেখ করেছি কবিতা ছেড়ে সমালোচনার কাজে নেমে পড়বার আরো কিছু জরুরি প্রয়োজন ছিল। সাহিত্যের ইতিহাসে কবিতা ছেড়ে সমালোচনার কাজে আত্মনিয়োগ করবার দৃষ্টান্ত বিরল ত নয়। মোহিতলাল নিজেও মনে করতেন বয়স বাড়লে দৃষ্টি শক্তি বাড়ে কিন্তু সৃষ্টি শক্তি কমে যায়।[১৬] কিন্তু সেকালের সাহিত্য চর্চার পক্ষে সমালোচনাকে অত্যন্ত দরকারি বলে মনে হয়েছিল তাঁর। এমন কি কালিদাস রায়কে লেখা তাঁর চিঠি থেকে বুঝতে পারি সৃষ্টির চেয়ে সৃষ্টির বীক্ষণ বিশ্লেষণই বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল তাঁর কাছে :

> সৃষ্টি সংরোধই যে চাই। সৃষ্টির দিন কি আর আছে ? মাইকেল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে সৃষ্টি প্রেরণা তাহা **exhausted** হইয়াছে। সৃষ্টির নামে অনাসৃষ্টি চলিতেছে। এখন ঢালিয়া সাজিবার দিন আসিয়াছে - ইহা কি বুঝিতে পারিতেছেন না ? এখন নিরিখ ঠিক করিবার পরিমাপ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। ... এখনকার যে কোনও পত্রিকার যুগোচিত কর্তব্য হইতেছে - উপযুক্ত সমালোচনা। তার উদ্দেশ্য সাহিত্য ভূমিতে সার দেওয়া। প্রচুর ফসলের পর জমি বীর্যহীন হইয়াছে ভালো করিয়া নিড়াইয়া সার দেওয়ার নামই সমালোচনা - তবেই আবার উৎকৃষ্ট ফসল ফলিবে।[১৭]

আর একটি চিঠিতেও লিখছেন :

> এখন সবচেয়ে দরকার পড়েছে জীবন্ত সাহিত্যের রসসন্ধান। তার জন্য **Modern literature** ও **Modern study of literature** এর আদর্শ ও পথ নির্দেশ করতে হবে। সাহিত্যিক রসবোধটাই দেশ থেকে যেন উবে গেছে, সেই-টেকেই আবার জাগাতে হবে। সাহিত্য বিচারের ধারা বদলানো চাই - যে আদর্শ আধুনিক সাহিত্যে উপযোগী সেই আদর্শ জ্ঞান আমাদের দেশে এখনো জাগেনি ...[১৮]

মোহিতলাল কাব্যরচনার পাশাপাশি প্রথম থেকেই সমালোচনা লিখতে শুরু করেছিলেন। ভারতী এবং প্রবাসীতে তিনি কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কিন্তু শনিবারের চিঠিতে পৌঁছে তাঁকে ক্ষুদ্র ও মিথ্যার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠতে হল। আজীবন কাব্যরস বিভোর মানুষটিকে দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য যেন কোন "দৃঢ় প্রত্যাদেশের তাড়নায়"[১৯] নিজের "কবিজীবন স্বেচ্ছায় ত্যাগ"[২০] করে "খাঁটি সাহিত্যের আদর্শ ও নীতির প্রতিষ্ঠাকল্পে অবারিত লেখনী চালনা"[২১] করতে হল। অপরপক্ষের কুতর্ক ও মূর্খতার প্রত্যুত্তর দান করে বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টিধর্মী সমালোচনা এবং সাহিত্যিক রসতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করতে হল। "যে সকল সাধনাহীন প্রতিভাহীন যন্ত্রহীন ও বিদ্যাহীন লেখকের উপদ্রবে সাহিত্য লক্ষ্মী নির্বাসিত-প্রায় তাহাদিগকে বংকিমচন্দ্রের ন্যায় দৃঢ়হস্তে, বাণী মন্দিরের ত্রিসীমানা হইতে বহিষ্কৃত"[২২] করে দেবার জন্য সমালোচনার বীজমন্ত্র উচ্চারণ করতে হল তাঁকে।

২. দেশকাল

মোহিতলাল জন্মেছিলেন উনিশ শতকের শেষ পাদে(১৮৮৮) আর তাঁর যৌবনারম্ভ হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দেশব্যাপী উদ্দীপনার মধ্যে। তখনকার ভাষণমুখর সমাবেশ এবং পদযাত্রার মিলিত গতিছন্দ তাঁর মনকে আকৃষ্ট করেছিল। সেদিনকার স্বদেশী আন্দোলনের রাজনীতি তিনি অনুধাবন করেননি কিন্তু তার প্রণোদনাটি তিনি নিজের জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে "বাংলার নবযুগ" প্রসঙ্গে এই কথা বারংবার স্মরণ করেছেন। এই পরিবেশ-পটটুকুকে দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের আলোচনা প্রসঙ্গে উত্থাপন করেছেন। বঙ্গভঙ্গযুগের রাজনীতির মূল প্রেরণা হিসেবে ঐতিহাসিকেরা তিনটি সূত্রকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করেন। প্রথমত প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক আদর্শ তার প্রেরণা, দ্বিতীয় প্রেরণা শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের বাণী। আর প্রেরণার তৃতীয় উৎস বংকিমচন্দ্রের রচনাবলী।[২৩] আর এঁদের দ্বারা প্রভাবিত হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রতি মোহিতলালের ছিল গভীর আগ্রহ। পরবর্তীকালে তাঁর রাজনীতি চর্চার মূলসূর এই তিনের উৎসঙ্গেই পাওয়া। মোহিতলাল তাঁর সতেরো আঠারো বছর বয়সের সেই জাতীয় আন্দোলনের উদ্দীপনার কথা একটি প্রবন্ধে গভীর আবেগের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। সেদিনকার

জনসভাগুলির কথা সুরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের বক্তৃতা এবং গানের ভাব-প্রবাহের কথা তিনি দীর্ঘকাল পরেও অনুভব করেছেন।[২৪] তাঁর মনের মধ্যে সেদিনকার সেই ভাবাবেগের আকাশ-বাতাসব্যাপী বেষ্টন রেখা তাঁকে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের উদ্দীপনার মধ্যে বৃত্তবদ্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু তিনি নিজেই দেখেছেন কীভাবে সেই বিপুল ভাবাবেগ বিপ্লবের গোপন কুটিল পথ রেখায় প্রবাহিত হয়েছিল। তিনিও দেশের অন্যান্য রসভোক্তার মতো রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ যা অবদান তাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে উন্নত ভাবজীবনের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন।

তা সত্ত্বেও সে যুগের জীবনাদর্শের আবেগকে কোনদিন বিস্মৃত হতে পারেন নি তিনি। দীর্ঘকাল সাহিত্যিক রসোপভোক্তার জীবনযাপন করেছেন বটে কিন্তু বারবার সেই বিগতযুগের স্মৃতি তাঁর মনে উদিত হয়েছে। রাজ্য রাজনীতি নিয়ে তিনি মাঝে দীর্ঘদিন চিন্তা করেন নি বটে কিন্তু হিন্দু জাতীয়তাবোধের পশ্চাদপসরণ কিংবা তদানীন্তন রাজ্য রাজনীতিতে বাঙলা ও বাঙালীর অবস্থান তাঁকে সুস্থি দেয়নি। আর যেভাবে ভারতের স্বাধীনতা লাভ হল তাকেও ভিন্ন চিন্তার বৃত্তমেলি বেয়ে প্রায় তদানীন্তন রাজপুরুষদেরই মতো স্বীকার করেননি মোহিতলাল। কুমুদরঞ্জন মল্লিককে একটি চিঠিতে লিখছেন :

> আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি এ ধারণা আপনারও হইয়াছে দেখিলাম, দুঃখিত হইলাম। ইংরেজ চলিয়া গিয়াছে উহা আপনিও বিশ্বাস করেন ! ইংরেজ কি সত্যই গিয়াছে ? ছোটবেলায় যাত্রার রাবণবধ পালায় রাবণবধ হইল দেখিয়া শিশুমনে কষ্ট হইয়াছিল পরে দেখিলাম সেই লোকটিই আসরে বসিয়া বিড়ি খাইতেছে। মনটা সুস্থ হইল। ইংরেজ তেমনই মরে নাই, যায় নাই, আসরে বসিয়া বিড়ি খাইতেছে।[২৫]

হিন্দু বাঙালীর পশ্চাদপসরণ মোহিতলাল পছন্দ করেন নি তেমনি রাজনীতি ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের প্রভাব ক্ষুন্ন করে গান্ধীজীর প্রতিষ্ঠাকেও ভালো মনে মেনে নিতে পারেননি। রাম মোহনের সময় থেকে বাঙলা ও বাঙালীর যে গৌরববোধ তা বিশশতকের প্রথম থেকেই ক্ষুন্ন হচ্ছিল। বাঙলাদেশের মুসলমানেরা বিভিন্নক্ষেত্রে হিন্দু বাঙালীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছিলেন। তাছাড়া ব্রিটিশরাও ১৯৩২এ বর্ণ হিন্দু ও নিম্নবর্ণীয়দের ভেদ স্বীকার করে নেওয়ায় বর্ণ হিন্দুদের প্রতিপত্তি আরো ক্ষুন্ন হয়েছিল। যে বাঙালী একসময় ইংরেজ-রাজের হাত ধরে সারা ভারত

ভ্রমণ করেছে তার বিদ্যাবত্তা বুদ্ধি ও মার্জিত রুচির ঔজ্জ্বল্য অনেকের চোখ ধাঁধিয়েছে তার দৈন্যের মলিনমূর্তি মোহিতলালের মতো জাতিপ্রেমিক মেনে নিতে পারছেন না ।

বস্তুত মোহিতলালের সমগ্রজীবনই বাঙলা ও বাঙালীর সংবিত সম্প্রসারণের জন্যই উৎসর্গীকৃত। সারাজীবন তিনি বাঙালী সংস্কৃতির স্খলিত অবস্থা দেখে কাতর হয়েছেন অধঃপতিত বাঙালীকে তার সুস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বঙ্গভঙ্গ যুগের আন্দোলনের মধ্যে যে বঙ্গ-গৌরব-বাদ প্রচারিত হয়েছিল তারই আর একরূপ দেখতে পাই তাঁর বাঙলা ও বাঙালী গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি "পিতা পিতৃভূমি এবং পিতৃধর্মের" গুণকীর্তন করে ধন্য হয়েছিলেন। বাংলার নবযুগ শেষ করে শনিবারের চিঠির পাঠক পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন :

> এই দীর্ঘ ও দুরূহ চিন্তা কার্যে আমার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল বাঙালীর আত্মপরিচয় সাধন ... এই একাকার অন্ধকারে আমি যদি সেই চেতনা এতটুকুও উদ্রেক করিয়া থাকিতে পারি তবে আমার এই অসাধ্যসাধনের চেষ্টা সফল হইয়াছে মনে করিব, আমার সাহিত্যিক জীবনও ধন্য হইবে। আজিকার এই অতি উদার কালচার-বাদ ও বিশ্বমানবীয় ভাব বিলাসের দিনে আমি আমার স্বজাতির ভাবনাই বিশেষ করিয়া ভাবিয়াছি এবং তাহার গৌরব প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হইয়াছি সেজন্য আমি কিছুমাত্র লজ্জিত নই, ... বাঙালীকে যদি বাঁচিতে হয় তবে তাহাকে বাঙালী হইয়াই বাঁচিতে হইবে ... অখন্ড ভারত নামে মাটির উপরে মানচিত্রে কোন দেশ নাই, ভারতীয় সংস্কৃতি বলিতে যাহা বুঝায় তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া পুনঃসৃষ্টি করিবার শক্তি বাঙালীর আছে, ... এমন কথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে ভারতীয় সংস্কৃতিকে বাঁচাইবার - সেই অখন্ড ভারতকে উদ্ধার করিবার প্রতিভাশক্তি বাঙালীরই আছে, বাঙালী ঘুমাইলে সেই ভারতের সকলেই ঘুমাইবে ... [২৬]

সজনীকান্ত ঠিকই লিখেছিলেন :

> বং কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ চিন্তায় নিছক সাহিত্য ছাড়া অপরক্ষেত্রে বরাবর তৎপরতা দেখাইয়াছেন কিন্তু মোহিতলালের মত সর্বস্ব খোয়াইয়া এমন তলাইয়া ডুবিয়া যান নাই। [২৭]

এ কথা সর্বৈব সত্য । মোহিতলাল বলতেন :

> আমি যতটুকু বাঙালী ততটুকুই সাহিত্যিক, আজ সেই বাঙালী জাতটাই চোখের সামনে মরে গেল - বাঙলা সাহিত্যে আমার কি কাজ ।[২৮]

মোহিতলাল নিজে বলেছিলেন তাঁর চিত্ত বিকাশ হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণের মধ্যাহ্ন দিবালোকে, বংকিম বিবেকানন্দ বিদ্যাসাগরের যুগে। তেমন যুগ জাতির ইতিহাসে একটা গৌরবময় যুগ যে যুগে জ্ঞানকর্ম ও প্রেমের মানুষী সাধনার জন্য দেবকুল যেন বাংলা দেশে অবতীর্ণ হয়ে ছিলেন।[২৯] বস্তুত উনিশ শতক বাঙালী জীবনের এক আশ্চর্য সময় আমাদের ভাবজীবনকে ব্যাপ্ত করে যা আজও আমাদের মনঃক্ষেত্রে অবিচল রূপে বিদ্যমান। আর মোহিত-লালের মনে এই উনিশ শতকের জীবনাদর্শ হয়ে উঠেছিল পরাদর্শেরই এক আর্কিটাইপ তাঁর মানসজীবনের একমাত্র আদর্শ ক্ষেত্র। তাই তাঁর বারবার মনে হয়েছে তিনি সেই যুগ থেকে যেন পতিত হয়েছেন "I am fallen on evil days" বলেছেন বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি "out of time" এবং "Out of Place"।[৩০] প্রবোধ চন্দ্র সেনকে লিখছেন নিজের কালের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের অক্ষমতার কথা এবং মানিকচন্দ্র দাশকে একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন "আমি গত যুগের একটা নিরর্থক জঞ্জালরূপে এখনো টিকিয়া আছি।"[৩১]

৩. সাহিত্যিক পরিবেশ

মোহিতলালের চৌষট্টি বছরের জীবৎকাল (১৮৮৮-১৯৫২) বাংলা দেশের সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ঘনঘটায় পূর্ণ। তাঁর জন্মের তিন বছর আগে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছে আর মৃত্যুর দু-বছর আগে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধান ঘোষিত হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, দুটি বিশ্বযুদ্ধ, রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, ভারতের স্বাধীনতালাভ সবই এই পর্বের ঘটনা। এই পর্বে বাংলা সাহিত্যেরও বেশ বড়ো সড়ো পালাবদল হয়েছে । তাঁর জন্মের ছ বছর পরে (১৮৯৪) বংকিমের মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুও(১৯৪১) এই পর্বের

মধ্যে পড়ে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মোহিতলাল মানসী পত্রিকা অবলম্বন করে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তাঁর সেই কাব্য পরিবেশ ছিল বংকিম রবীন্দ্র অধ্যুষিত, বিশেষত বাংলার নবজাগরণের উদ্দীপনা অবসিত হলেও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ভাবাবেগ তখনো জনমানসে ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু এই কাব্যপরিবেশ কিছুটা ক্ষুণ্ন হল কল্লোল (১৯২৩) পত্রিকার প্রকাশে। ১৯২৬ থেকে কালি-কলম এবং প্রগতি প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯২৪ থেকে বেরোতে থাকে শনিবারের চিঠি। এ সব কাগজের চাপান উতোর থেকে মোহিতলাল দূরেই ছিলেন যদিও তাঁর দু একটি কবিতা কল্লোলে ও কালি কলমে বেরিয়েছিল।[৩২] মোহিতলাল তখন লিখতেন ভারতী তে এবং প্রবাসীতে। শনিবারের চিঠির আড্ডায় কখনও কখনও বসতেন বটে তবে লেখেননি। কিন্তু অকস্মাৎ "কোন একটি ঘটনার সাক্ষাৎ তাড়নায়"[৩৩] তিনি "সেই সাপ্তাহিক হুল্লোড়ের মধ্যে একরূপ নিক্ষিপ্ত"[৩৪] হয়ে পড়েন। এ ঘটনা ১৩৩১ এর। এরপর থেকে শনিবারের চিঠিই তাঁর সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

মোহিতলাল যে সময় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন তখন বড়ো কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের মধ্য গগণে দেদীপ্যমান। এসে এলেন শরৎচন্দ্র। তিনি নিজে যে কবিতা নিয়ে বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেছিলেন তাতে ছিল দেবেন্দ্র নাথ সেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী সম্পাদিত জাহ্নবী পত্রিকায় তাঁর জীবনমৃত্যু নামক দুটি চতুর্দশপদী কবিতা ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়। মানসী পত্রিকায়ও তাঁর বেশ কটি কবিতা বেরিয়েছিলো ১৩১৫-১৩২১ এর মধ্যে। প্রথম কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩২৮এ (স্বপন পসারী)। রোমান্টিক এই সৌন্দর্য পিপাসা তাঁর বিস্মরণী (১৩৩৩) কাব্যেও প্রখর। ১৩৪৮এ তাঁর শেষ কাব্য হেমন্ত গোধূলি বেরিয়েছে বটে কিন্তু তার প্রায় সবগুলি কবিতাই আগেকার রচনা।

মোহিতলাল তাঁর সময়কার সাহিত্য পরিবেশকে সুনজরে দেখেননি। তাঁর চিঠি পত্রেও বহুবার সে রকম কথা তিনি বলেছেন। আর এ বিষয়ে সমকালীন সাহিত্যের হাওয়া ফেরানোর জন্য তিনি উদ্যোগী হয়ে ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য ছাত্র নীরদ চন্দ্র চৌধুরীকেও তিনি এই সাহিত্য

যুদ্ধে নামবার প্রেরণা দিয়েছিলেন। নীরদবাবু তাঁর আত্মজীবনীতে এই প্রেরণার কথা স্বীকার করে লিখেছেন তখনকার নবীন-সাহিত্য আন্দোলন বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল বলে এঁরা তার বিরোধিতা করেছিলেন। মোহিতলালের এই নবীন বঙ্গ সাহিত্য সম্বন্ধে ছিল তীব্র অনীহা, নীরদবাবু লিখেছেন - "a violent dislike for any kind of writing which was not affiliated with the established tradition".[৩৫] এর কারণও নীরদবাবু নির্দেশ করেছেন সাহিত্যপ্রাণ এই মানুষটির মনের টান ছিল পুরোন সংস্কৃতির দিকে, তিনি নিজে ছিলেন "a Bengali Hindu conservative of the school of Bankimchandra Chatterjee and Swami Vevekananda".

বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল যখন গদ্যপ্রবন্ধ সমালোচনা লিখতে এলেন তখন এ রকম লেখা খুব কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথের ভালো সমালোচনাগুলি লেখা হয়ে গিয়েছিল। 'সাহিত্য'এর প্রবন্ধগুলিও তখন মোহিতলালের সামনে ছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি লিখছিলেন। বলেন্দ্রনাথ রামেন্দ্র সুন্দর প্রমুখের লেখা ছিল, অজিত চক্রবর্তীর রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার (১৯১২) বইগুলি তো ছিলই উপরন্তু ছিল তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বহু আলোচনা সমালোচনামূলক রচনাবলী। প্রমথ চৌধুরী তখন সবুজপত্র প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যে গদ্য প্রবন্ধ সমালোচনার একটা নূতন গতি আনতে চাইছেন। আরো অনেক খ্যাত অল্প খ্যাত লেখকের রচনা নিত্য প্রকাশিত হচ্ছিল। কিন্তু মোহিতলাল সেগুলিকে অপ্রতুল মনে করেছেন, বিশেষ গুরুত্বও দেননি। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে তাঁর কিছু শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু সেগুলির আলোচনাপ্রণালী বা যুক্তি-মীমাংসার পদ্ধতি খুব সুষ্ঠু নয়[৩৭] বলে তিনি মনে করতেন। আর তাই তাঁকে সাহিত্যের নির্বিশেষ তত্ত্ব এবং বিশেষ সমালোচনা লিখতে হয়েছে। সে সব লেখার মূল উদ্দেশ্য সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা এবং প্রকৃষ্ট রসতত্ত্বের আলোচনার দ্বারা মানুষের মন থেকে সমকালীন অশালীন সাহিত্যের প্রভাব মুছে ফেলার ইচ্ছা।

৪.

সাহিত্য বিবেক

মোহিতলালের কাব্যবোধ জেগেছিলো তাঁর পিতার কাব্যপ্রীতির প্রভাবে। কাব্য মঞ্জুষার পরিশিষ্টে নিজেই তিনি সে কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর পিতা নন্দলাল ছিলেন আত্মভোলা, উপার্জনে উদাসীন এবং কাব্যানন্দে বিভোর সদানন্দ প্রকৃতির মানুষ। মোহিতলাল দুটি বৈশিষ্ট্যই পেয়েছিলেন। সজনীকান্ত তাঁর আত্মস্মৃতিতে যে কাব্য পাগল মানুষটির বর্ণনা করেছেন তাতেও এই বৈশিষ্ট্য দুটি ফুটে উঠেছে। যেভাবে সজনীকান্তকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দরিদ্রের সংসারে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠা করেন নি মোহিতলাল, সংসারের অনসংস্থানের প্রতিও যে ঔদাসীন্য এবং কাব্যাস্বাদনে তাঁর যে আত্যান্তিক অনুরাগ সজনীকান্ত বলেছেন "সর্বযুগের মোহিতলালের ইহাই খাঁটি পরিচয়।"[৩৮] তারাশংকরও অনুরূপ সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর 'শনিবারের চিঠি'র ভাদ্র ১৩৫১ সংখ্যায় তারাশংকর লিখেছিলেন :

> মোহিতলালকে আমার সন্ন্যাসী বলেই মনে হয়েছিল সেদিন। ... জ্ঞানযোগে তাঁর দৃষ্টির গভীরতা, ধ্যানযোগের মত সাহিত্য তন্ময়তা, নিজের মতের দৃঢ়তা, জীবন ও জীবন ব্যাখ্যায় শুচিতা ও অশুচির ঊর্ধ্বস্তরের অনুভূতি অথচ প্রকাশে জ্যোর্তিময় পবিত্রতার ধারনা, সাধনফল সম্পর্কে নির্লোভ অনাসক্তি দেখে আমি তাঁকে সন্ন্যাসী ভাবতে দ্বিধা করিনি। দু একবার ঢাকা গিয়ে সংসারের মধ্যেও মোহিতলালের সন্ন্যাসের আসন আমি দেখে এসেছি।[৩৯]

যেমন পিতৃ-প্রভাবে সংসার ঔদাসীন্য তেমনি মায়ের ছাঁচে অভিমানী মনটি পেয়েছিলেন মোহিত লাল। অভিমানের সঙ্গে ছিল স্পর্শ-কাতরতা। কালিদাস রায় লিখেছেন :

> কবি ছিলেন অত্যন্ত অভিমানী, অতি সামান্যেই আঘাত পেতেন, সবসময়ই ভাবতেন তাঁর সম্মান হানি হচ্ছে - তাঁর প্রতি অনাদর হচ্ছে, সেজন্য অবিরত চারদিক হতে কেবল আঘাত পেতেন। অধিকাংশ আঘাতই তাঁর কল্পনাপ্রসূত বা ভুল বোঝার ফল।[৪০]

এই অভিমান স্পর্শকাতরতা এবং অতিশয় আত্মমর্যাদাসম্বন্ধে সচেতনতার জন্য অতি নিকটজনের

সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সুশীল কুমার দে, সজনীকান্ত দাস এবং তারাশংকরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এমনই হয়েছিল যে মাতৃশ্রাদ্ধে তাঁদের পত্র-দ্বারা নিমন্ত্রন করতেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন।[৪১] মোহিতলালের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, অহংমত্ততা এবং প্রতিপক্ষের প্রতি অসহিষ্ণুতার কথা প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রায় সকলেই উল্লেখ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর শনিবারের চিঠির স্মরণ সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩৫১) একটি চতুর্দশপদী পদ্যে কুমুদরঞ্জন তাঁর ব্যক্তিত্বের এই পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেছিলেন।

মনীষী তবুও এক গুঁয়ে আর রাগী,
আনন্দ পায় হতে যেন দুখ ভাগী।
মোটেই বশ্য নমনীয় সে যে নয়,
কেহই তাহাকে করিতে পারে না ক্রয়।
দেশ ও জাতির প্রতি কি দারুণ টান
দিয়াছেন বিধি তারে যে বিরাট প্রাণ।
ভৈরব সম বিল্বতরুর তলে -
থাকে সে ধেয়ানে ধুনিটি তাহার জ্বলে,
অল্প আহারী, বিল্বেই মিটে ক্ষুধা,
গ্রাহ্য করে না ইন্দ্রের দেওয়া সুধা।
পূজে না সত্য-শিব-সুন্দর ছাড়া,
মতভেদে করে চিমটা লইয়া তাড়া।
বচন তাহার নয় মোর মনোহারী
দূর থেকে তাই বেলপাতা ছুঁড়ে মারি।

এই পদ্যের প্রতিটি শব্দই প্রায় আক্ষরিকভাবে সত্য। সেকালের অনেকেই তাঁর রুদ্ররূপে ভীত এবং ত্রস্ত ছিলেন। মোহিতলাল নিজেও নিকুণ্ঠ চিত্তে তাঁর এই উগ্রমূর্তি প্রদর্শন করেছেন :

> আমি যাহা নই অনেক সময়ে কেবল মাত্র বিরক্তি ও সত্যসুন্দরের জন্য যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি বশে তাহাকেই স্বরূপ ঘোষণা করিয়া থাকি। [৪২]

কিন্তু তাঁর এই সচেতন যোদ্ধবেশ অচিরেই হয়ে পড়েছে তাঁর সহজাত, তিনি রূপ ও স্বরূপের ব্যবধান বিস্মৃত হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত একটি স্বোপার্জিত ব্যক্তিত্ব তাঁর চরিত্রের পরিচায়ক হয়ে উঠেছে। যে মোহিতলালকে দূর থেকে বেলপাতা ছুঁড়ে দিয়েছিলেন কুমুদরঞ্জন, বনফুল তাঁরই উদ্দেশ্যে সভয় প্রণাম নিবেদন করে গেছেন। মোহিতলালের মধ্যে তিনি দেখেছেন সত্য সন্ধানী এক নিঃসঙ্গ কবিকে যাঁর বাণী "ক্ষোভশতদলেই"[৪৩] মূর্ত হয়েছিল। অবশ্য মোহিতলাল মনে করতেন বনফুল তাঁর চরিত্রকে জঙ্গম উপন্যাসে ছোট করে এঁকেছেন। এজন্য তিনি ক্ষুন্ন হয়েছিলেন। তিনি "সাহিত্যিক সত্যনিষ্ঠা বশে"[৪৪] উপন্যাসটির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। মোহিতলালের যে খর ব্যক্তিত্বে কুমুদরঞ্জন এবং বনফুল ত্রাস্ত, তারাশংকর অভিভূত, কবি যতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত তাঁকে হুতাশন কবি বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু সে অনল যজ্ঞানল।

যে অনল জ্বলে যজ্ঞকুণ্ডে
অরণি সমুত্থিত
হবি ও সমিধে কভু প্রোজ্জ্বল
কখনো বা ধূমায়িত ...

ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু যম যার
প্রসাদ কামনা করে
সুবর্ণশাসন সেই হুতাশন
কদাচিৎ চোখে পড়ে।[৪৫]

অগ্নির উপমা এরকম অচিন্ত্য কুমারের মনেও এসে গিয়েছিল তাঁর প্রতি পূজা প্রণোদিত প্রণাম নিবেদন করতে গিয়ে :

> মধ্যাহ্নে দেখেছি তাঁর নিদারুণ কঠোরতা। মধুর তখন দেখা দিয়েছিলেন নিষ্ঠুর রূপে। ... দূরে সরে দাঁড়িয়ে সেই দারুনিরুদ্ধ বীর্য অনল শিখাকে শ্রদ্ধা করেছি মনে মনে। সমস্ত ধূমাঙ্কিত ক্লিন্নতার ঊর্ধ্বে বিরাজমান দেখেছি সেই দীপ্তপ্রভা। শ্রীমদ্ভাগবতের সেই কথাই বারে বারে মনে পড়েছে 'তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নে সর্বভুজো যথা।[৪৬]

ব্যক্তিত্বের এই খরদ্যুতি যা সেদিন সকলের চোখে পড়েছিল, তার মূলে ছিল সাহিত্যব্রত সম্বন্ধে অতিশয় উচ্চ আদর্শবোধ। "Bengali literature was his life"[৪৭] - কথাটা নীরদ চন্দ্র বলেছেন, কিন্তু মোহিতলালের অনুরূপ অজস্র মন্তব্য তাঁর চিঠিপত্রে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। তার মধ্যে আছে তাঁর সাহিত্যব্রত সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাষণ। কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধার করি :

১. সাহিত্য জিনিসটা আমার কাছে একটা ধর্ম সাধন - একটা মহাব্রত, হুজুগ ফ্যাশন খেলা বা চা সিগারেটের মত নেশা নয়।[৪৮]

২. আমার সাহিত্যই একমাত্র ধর্ম, উহাই আমার আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ, বাণীই আমার একমাত্র সাধন বিগ্রহ; সত্য ও সুন্দরের পূর্ণতম ও নিখুঁত প্রকাশ আমি তাহার মধ্য দিয়াই চাই।[৪৯]

৩. সাহিত্য ব্রতটি একেবারে নিঃস্বার্থ হওয়া চাই। কঠিন অপ্রিয় উক্তি বা সমালোচনা আমি পছন্দই করি কিন্তু আদর্শ নিষ্ঠা চাই আন্তরিকতা চাই। সাহিত্যের মর্যাদা প্রাণপণে রক্ষা করতে হবে কিন্তু সাহিত্যিকের নয়। তাহলে সত্যভ্রষ্ট হবেন। ... যা মন্দ ও মিথ্যা তাকে দহন করবার জন্য বজ্রশক্তি প্রয়োগ করুন তাতে আদর্শ নিষ্ঠার নিঃস্বার্থতা যেন প্রকাশ পায়, ব্যক্তিগত বা দলগত বিদ্বেষ যেন তাতে না থাকে। মনে থাকে যেন আপনি একটা বড় Ideal নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন।[৫০]

৪. আমার একটা অহংকার আছে তাহা এই, আমি যশ বা প্রতিপত্তির কাঙাল নই - আমি কাহারও ভক্তি বা প্রশংসাও কামনা করি না ...আমি নিজ জীবনে আমার জ্ঞান শক্তি মত সারস্বত সাধনা করিয়াছি সে সাধনায় সরস্বতী ছাড়া কোন ব্যক্তি অথবা নিজেকেও এতটুকু নির্বিচারে সম্মান দিই নাই।[৫১]

বস্তুত এই অতিশয় উচ্চ সাহিত্যাদর্শ নিয়ে দেশ ও জাতির প্রতি দায়বদ্ধ এক শিল্পী শুধু স্বজাতির আত্মপরিচয় উদঘাটন করতে গিয়ে "নিজেকেই হত্যা"[৫২] করেছেন। তাঁর সেই আদর্শ, কল্যাণ সাধনের সেই চেষ্টা তিনি বলেছেন স্পর্ধা হতে পারে কিন্তু তাতে কোন মিথ্যাচার নাই।[৫৩]

মোহিতলালের এই দেশপ্রেম, স্বজাতিবাৎসল্য, তাঁর শেষ পর্বের সাহিত্য চিন্তার মূল প্রসঙ্গ। তিনি নিজে তাঁর এই দেশ বাৎসল্য ও স্বজাতি চিন্তাকে বলেছেন 'দৈবঘটনা'। মোহিতলাল-এর কাব্য জীবনের প্রথম পর্বে ছিল ব্যক্তি চিত্তের রস পিপাসা আর শেষ পর্বে সে জায়গা নিয়েছে দেশের সংস্কৃতিরক্ষার দায়িত্ব। কাব্য লিখে সে দায়িত্ব পালন করা যায় না বলে তাঁকে নিতে হয়েছে গদ্য, যে গদ্যের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে প্রায় ভারতচন্দ্রের মতো তাঁকে 'চেতোরে চেতোরে চেতো' বলে স্বজাতির প্রতি আহ্বান জানাতে হয়েছে।

তবু বাংলা সাহিত্য বাসরে যে মোহিতলালের ব্যক্তি স্বরূপকে দেখছি তার কোন বিকাশ সূত্র যেন নেই। সত্য সন্ধানীর তৃষ্ণার্তি নিয়ে তাঁকে জীবন সন্ধান করতে হয়নি। সত্য বটে জীবনের রুদ্ররূপ তিনি লক্ষ করেছিলেন একদা উত্তরবঙ্গের প্রকৃতির মধ্যে, তবু তা জীবনের একটি দিক। তাঁর জীবনে সত্যের সঙ্গে পরীক্ষার কোন উদ্দীপনা নেই, নিজের মধ্যে আবর্তিত হয়ে কোন সত্যের হিরন্ময় রূপ তাঁকে আবিষ্কার করতে হয়নি - দেশ ও জাতির বলাধান নায়ক এক বাহ্যিক সত্যের বাস্তবমূর্তি তিনি জীবনের উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করলেন অকস্মাৎ, যাকে তিনি বারংবার বললেন দৈব ঘটনা - দৈব ঘটনাই - কেননা যে কারণে তাঁকে শনিবারের চিঠির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে হল - তার কোন কার্যকারণ পরম্পরা আবিষ্কার অসম্ভব। আর এই আবর্তে আবিল হতে গিয়েও নিজের সাহিত্য ধর্মের শক্তিতে সাহিত্যব্রতের মাহাত্ম্যে তিনি শনিবারের চিঠিকে করে তুললেন সাহিত্যের একটি পীঠস্থান, আর এই সাহিত্যের অনাচার দূর করবার প্রতিজ্ঞা থেকে চলে এলেন দেশ ও জাতির অবক্ষয় রোধ করবার মহৎ কর্মে। এ সবের মধ্যে যে জীবন তিনি বিলিয়ে গেলেন তার ভিতর দিয়ে কোন সত্যের জ্যোতি অনির্বাণ হয়ে জ্বলে উঠলো না - যা তাঁর জীবন, সত্যের তৃষ্ণার্তি নিয়ে তাঁর জীবন হয়ে উঠলো না গান্ধীর মতো - এমন কি রবীন্দ্রনাথের মতোও; নরজিস গোডমুন্ডের মতো হেসের আঁকা মানুষও তিনি নন - বহু উত্থান পতন পেরিয়ে একটি সত্যের শিখা হয়ে জ্বলে ওঠেনি তাঁর জীবন। সত্য তাঁর কাছে স্বয়ং প্রকাশ, জীবনের প্রতি আরোপিত কিন্তু জীবন সমুদ্ভব নয়।

সাহিত্য সাধনায় তিনি এসেছিলেন একটু দেরীতেই এবং প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার সময় ভূমিকায় লিখেছিলেন 'প্রথম বয়সের রচনা ইহাতে একটিও নাই"[৫৪], আর অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের সমালোচনার ভ্রান্তি নিরসন করে লিখলেন "বিস্মরণী ও স্মরগরল আমার শ্রেষ্ঠকাব্য - একথা কে বলিল ? ইহা ত সত্য নয়। আমার প্রত্যেক কাব্যেই সমমূল্যবান।" [৫৫]

ছাত্রাবস্থায় কবিতা লেখেননি, নিজেকে প্রস্তুত করেছেন নানা বিদ্যাচর্চায়, সাহিত্যক্ষেত্রে এসেছেন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে, সে প্রস্তুতি আছে আমাদের চোখের বাইরে, এবং সাহিত্যে এসে পড়বার পর তাঁর মনশ্চরিত্রের পরিবর্তন আর হয়নি - কেবল কোন কোন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ হয়েছে মাত্র - নতুবা সেখানে তিনি নির্বিকার। তাঁর ব্যক্তিত্বের এই দৃঢ়মূর্তি সত্য-বোধের অবিচলতার স্বয়ং-প্রকাশ। সৌকর্যের প্রতি তিনি আগ্রহী, কিন্তু নিরলস — সত্যের শূলবিদ্ধ সৌন্দর্যের অবয়ব নির্মাণে। তাঁর ব্যক্তি-বিবেকের কাছে যা অকল্যাণ বলে গ্রাহ্য হয়েছে তার প্রতি তিনি খড়্গপাণি। সেজন্যই সেকালের সাহিত্য সমাজে তিনি দন্ডপাণি সাহিত্যিক।

110759
18 JAN 1994

প্রথম অধ্যায় ।।

সূত্রনির্দেশিকা ও টীকা

১. কালিদাস রায়, চল্লিশ বছরের বন্ধু মোহিতলাল, শনিবারের চিঠি, ভাদ্র ১৩৫৯ পৃ ৪৫২

২. সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, ভবতোষ দত্ত ও আজহার উদ্দীন খাঁন (সম্পাদিত), মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ, জিজ্ঞাসা ১৯৬৯, পৃ. ১৬৯ (অতঃপর পত্রগুচ্ছ নামে অভিহিত)।

৩. কালিদাস রায়কে লেখা চিঠি, দ্র. অলোক রায় সম্পাদিত মোহিতলাল মজুমদারের পত্রাবলী প্রতিক্ষণ, পত্রসংখ্যা ৬ (অতঃপর পত্রাবলী নামে অভিহিত)।

৪. জীবন জিজ্ঞাসা, বিচিত্রকথা - আমার কাব্য সাধনা পৃ.১৭৩।

৫. পত্রাবলী, প্রতিক্ষণ পত্রসংখ্যা - ১ ।

৬. পত্রগুচ্ছ, পৃ.১২৬।

৭. পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ১, পৃ.৭১।

৮. পত্রাবলী, প্রতিক্ষণ, পত্রসংখ্যা ৩।

৯. পত্রগুচ্ছ, পৃ.৯।

১০. ঐ

১১১. শ্যামসুন্দর মাইতিকে লিখিত পত্র, পত্রগুচ্ছ পৃ.১৮৫।

১২. পত্রগুচ্ছ, পৃ.১৪।

১৩. পত্রাবলী, প্রতিক্ষণ, পত্রসংখ্যা- ১

১৪. পত্রগুচ্ছ, পৃ.৫২।

১৫. অকাল বসন্ত, হেমন্ত গোধূলি, মোহিতলালের কাব্য সম্ভার মিত্র ঘোষ ১৩৬৭ পৃ.৩২৮।

১৬. জগদীশগুপ্ত গ্রন্থাবলীর জগদীশগুপ্ত পরিচিতি প্রসঙ্গে উদ্ধৃত, বসুমতী সাহিত্য/মন্দির দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৭. পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ২।

১৮. পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ৩।

১৯. আমি ও শনিবারের চিঠি। আজহার উদ্দীন খাঁনের বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল গ্রন্থের পরিশিষ্ট পৃ. ২৩১-২৩২ থেকে উদ্ধৃত।

২০. ঐ

২১. ঐ

২২. পত্রাবলী, পত্র সংখ্যা ২ প্রতিক্ষণ।

২৩. Leonard A Gordon, Bengal : The Nationalist Movement 1876-1940 Monohar Book Service, Delhi, 1974 p.173.

২৪. সাহিত্য বিতান, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, কলিকাতা ১৯৭৪, পৃ. ৬৭-৬৮।

২৫. শনিবারের চিঠি, ভাদ্র ১৩৫৯ পৃ. ৪৪৫, পত্রগুচ্ছ পৃ.১৪০।

২৬. বাংলার নবযুগ, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, কলিকাতা ১৯৬৫ পৃ. ১৯৬-১৯৭।

২৭. সংবাদ সাহিত্য, শনিবারের চিঠি ভাদ্র ১৩৫৯

২৮. পত্রগুচ্ছ পৃ.১৪১।

২৯. জাতির জীবন ও সাহিত্য, বিবিধ কথা, আমি আজহার উদ্দীন খাঁনের বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল গ্রন্থ থেকে নিলাম। পৃ.১৬৩।

৩০. পত্রগুচ্ছ, পৃ.৬।

৩১. পত্রগুচ্ছ, ২০২

৩২. কল্লোল পত্রিকায় পাশ্হ (১৩৩২ ভাদ্র), প্রেতপুরী (১৩৩২ অগ্রহায়ণ) বেরিয়েছিল কালিকলমের প্রথম সংখ্যায় (১৯২৬ ...) বেরিয়েছিল নাগার্জুন। 'উত্তরা'তেও লিখতেন।

৩৩. আমি ও শনিবারের চিঠি। বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল গ্রন্থের পরিশিষ্ট পৃ.২৩৩।

৩৪. ঐ

৩৫. Thy Hand : Great Anarch, Chatto & Windus London 1987, p.147.

৩৬. ঐ

৩৭. মানিক চন্দ্র দাসকে লেখা চিঠি, পত্রগুচ্ছ পৃ ১৯৮

আধুনিক বাংলা সাহিত্য, জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৩৬৫ ভূমিকা

৩৮. আত্মস্মৃতি, সুবর্ণরেখা ১৩৮৪ পৃ.১৩৫।

৩৯. শনিবারের চিঠি, ভাদ্র ১৩৫৯ পৃ.৪৬৩।

৪০. শনিবারের চিঠি, ভাদ্র ১৩৫৯ পৃ.৪৫০-৫১।

৪১. পত্রাবলী, প্রতিক্ষণ, পত্র সংখ্যা ২৫।

৪২. পত্রগুচ্ছ পৃ.৫।

৪৩. বনফুলের কবিতা, শনিবারের চিঠি, ভাদ্র ১৩৫৯ পৃ.৪৭০।

৪৪. কালিদাস রায়কে লেখা চিঠি, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ(সম্পাদিত),মোহিতলাল মজুমদার : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য প্রতিভা পৃ.২৪৮।

৪৫. শনিবারের চিঠি, ভাদ্র ১৩৫৯।

৪৬. ঐ পৃ.৪৭৮।

৪৭. Thy Hand : Great Anarch p.148.

৪৮. পত্রগুচ্ছ পৃ.১৭৪।

৪৯. পত্রগুচ্ছ পৃ.১৮৬।

৫০. পত্রগুচ্ছ পৃ.১৭০।

৫১. পত্রগুচ্ছ পৃ.১৭১।

৫২. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে লেখা, পত্রগুচ্ছ পৃ.২২৯

৫৩. ঐ

৫৪. স্বপন পসারী গ্রন্থের ভূমিকা, গ্রন্থকারের নিবেদন

দ্র. মোহিতলাল কাব্য সম্ভার, মিত্র ও ঘোষ ১৩৬৭।

৫৫. পত্রগুচ্ছ পৃ.৮২-৮৩